শব্দার্থ ও টীকা

9

শিলাইদহ থেকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

9.1 প্রস্তাবনা

এটি একটি চিঠির অংশবিশেষ। চিঠিও যে সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে এটি তার অতি সুন্দর নিদর্শন।

গুণান্বিত = গুণসম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথ অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলার শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে থাকার সময় এই চিঠি লিখেছিলেন তাঁর প্রিয় ভাইঝি (মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আর মেজবউদি জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা) বছর কুড়ির ইন্দিরা দেবীকে।

ওই সময় তিনি বাংলার পল্লিজীবনকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। তার ফলে পল্লিবাংলার প্রকৃতি আর মানুষকে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগও ঘটেছিল।

এই পত্রে মেঘলা দিনের একটি অনুপম চিত্র আঁকার পাশাপাশি কবি তাঁর হতদরিদ্র প্রজাদের অসহনীয় দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন। আর সেই প্রসঙ্গে এসেছে মানুষের দুঃখমোচন আর দারিদ্র্য দূর করা নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা। সমাজবাদীরা যে গোটা পৃথিবীতে সব মানুষের মধ্যে বিত্তের সমবণ্টনের কথা বলে থাকেন তার প্রতি কবির আস্থাও প্রকাশিত হয়েছে। এর অনেক পরে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখন তিনি একই রকম কথা বলেছেন।

অনুপম = অতুলনীয়।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রখানি লিখেছেন তাঁর তখনকার আর সমস্ত গদ্যরচনা সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু চিঠিতে তিনি সহজ ও সরল চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এই পাঠটি রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এটি ৯৫ সংখ্যক পত্র।

9.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- পল্লিবাংলার বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতির কথা;

শব্দার্থ ও টীকা

- গ্রামীণ মানুষের অসহায়তার কথা;
- সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে আশার আলোর সম্ভাবনা;
- অন্তরঙ্গ জনকে লেখা চিঠিও সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে।

9.3 মূল পাঠ

(1)

শিলাইদহ
১০ মে ১৮৯৩

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে— আর এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিংপ্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে। মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছিলেন, বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবোটোবো নধরনন্দন ভাব। এখনই বৃষ্টি আরম্ভ হল ব'লে— হাওয়াটা সেইরকম কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, শিমলার সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে।

ব্লটিং প্যাড = চোষ কাগজ।
অভ্রভেদী = আকাশ-ছোঁয়া, সুউচ্চ।
পর্বতশৃঙ্গ = পাহাড়ের চুড়ো।
সজলশ্যামল = জল-ভরা কালো রঙের।
টেবোটোবো = নাদুসনুদুস গোলগাল।

শব্দার্থ টীকা :

নধরনন্দন = সুপুষ্ট ও দেখতে ভালো।
পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় = দারুণ সূর্যতাপে কিংবা খরার দরুন জমিতে সরসতার অভাব ঘটার ফলে ফসল না-জন্মানোর অবস্থা।

(2)

আমার এই দরিদ্র চাষি প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে— কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।

(3)

সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের মূল আবশ্যক জিনিসও বন্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে-পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই,

সোশিয়ালিস্ট = একদল দার্শনিক যাদের মতবাদ হল : সামাজিক ভোগ্যবস্তুতে সমাজের সকলেরই সমান অধিকার।

শব্দার্থ ও টীকা

এর কোনো পথ নেই, তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায়, এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই। কিন্তু আবার এক-একবার রোদ্দুর উঠছে— পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে।

9.4 বিষয়ের রূপরেখা

9.4.1 বক্তব্যসার:

আকাশ-জুড়ে প্রচুর কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। মেঘের দাপটে চারপাশ থেকে সকালের রোদটুকু উধাও। জমাটবাঁধা মেঘের আয়োজন আর বাতাসের জোলো ভাব থেকে বোধ হচ্ছে এখনই বৃষ্টি নামল বলে।

মন্তব্য :

চিঠিলেখার তারিখ মে মাসের। গ্রীষ্মঋতু হলেও আগের দিন জোর বৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকালেও আবার বর্ষণের তোড়জোড় চলছে। পত্রলেখক তাই মেঘের দেবতার এ হেন আচরণে অপ্রসন্ন হয়েছেন।

এই পাঠ্যাংশে 'ফুলো ফুলো' 'বড়ো বড়ো' 'কাঁদো কাঁদো' 'ভিজে ভিজে' এমন শব্দদ্বৈত (অর্থাৎ একই শব্দকে পরপর দু-বার ব্যবহার করা) দিয়ে বহুবচনের ভাব বোঝানো হয়েছে। এই ধরণের শব্দদ্বৈতের সাহায্যে কোনো বিশেষ্যের কিছু গুণ বা প্রকৃতি বা অবস্থার কথা বলা হয়। যেমন, প্রথম বাক্যের 'বড়ো বড়ো' শব্দদ্বৈতটি মেঘ-এর প্রকৃতি নির্দেশ করছে— প্রচুর বিশাল আয়তনের মেঘ।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.1

অনুবিভাগ - ১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) কাঁচা (i) ..... রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা (ii) ..... দিয়ে একেবারে (iii) ..... তুলে নিয়েছে।

২) কোন জিনিসকে 'ফুলো ফুলো' 'বড়ো বড়ো' বলা হচ্ছে?

৩) বাতাসকে কেন 'কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে' বলা হয়েছে?

9.4.2 আমার এই দরিদ্র . . . সমস্ত ভুলে যায়।

বক্তব্যসার:

গ্রামবাংলার চাষিরা শুধু বৃষ্টির জলের উপর ভরসা করেই ফসল ফলানোর কাজে নামে। তাই আকাশের জল আর সূর্যকিরণ যাতে ঠিকমতো পাওয়া যায় সেজন্য তারা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে। কোনো কারণে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটলে কিংবা শস্যহানি হলে তাদের হা-হুতাশ করা ছাড়া গতি থাকে না। তারপর আবার

শব্দার্থ ও টীকা

যেই একটু সুরাহা হয় অমনি তারা ছেড়ে-আসা দিনগুলির করুণ অবস্থার কথা ভুলেই যায়।

মন্তব্য :

চিঠির গোড়ায় লেখক আকাশে মেঘের আনাগোনা আর জল-ভরা বাতাসের বর্ণনাটি সুন্দরভাবে দিয়েছেন। কিন্তু শুধু প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর মন আটকে থাকেনি, এই সময়ে তাঁর গরিব প্রজাদের অবস্থা নিয়েও তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সুউচ্চ শিমলা পাহাড়ে মা-বাবার সঙ্গে অবকাশ যাপন করছে যে পত্র-প্রাপক তাকে তিনি সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে গ্রামবাংলার প্রভূত পার্থক্যের কথা শোনাচ্ছেন। বলছেন নিম্নভূমির গরিব কৃষককুলের দুরবস্থা সেখানে বসে উপলব্ধি করা সহজ নয়। এখানকার চাষিদের শস্য ফলাবার জন্য আকাশের দয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়। উনিশ শতকের প্রায় অন্তিম লগ্নে যখন এই পত্র লেখা হচ্ছে তখন পরাধীন ভারতে ফসলখেতে সেচ বা সারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। চাষিদের জীবনযাত্রা ছিল দুঃসহ। কিন্তু কোনোক্রমে একটুমাত্র সুখের উদয় হলেই তাদের আর আগেকার দুঃখময় অবস্থার কথা মনে থাকে না।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.2

১) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) 'বিধাতার শিশুসন্তানের মতো' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে:
(i) শিমলার অধিবাসী, (ii) পল্লির দরিদ্র চাষি প্রজা

(খ) প্রজাদের প্রতি পত্রলেখকের মনোভাব কীরকম :
(i) তারা মায়ার পাত্র, (ii) তারা সুখী মানুষ (iii) তারা প্রীতিভাজন

২) গ্রামের দীনদুঃখী মানুষ কীভাবে দিন কাটায়?

৩) 'পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়'— এই বাক্যবন্ধের দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

9.4.3 সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত . . . যথেষ্ট জমে আছে।

বক্তব্যসার :

সোশিয়ালিস্ট বা সমাজতন্ত্রীরা চায় পৃথিবীজুড়ে মানুষের মধ্যে বিত্তের সমবণ্টনের ব্যবস্থা কায়েম করতে। বাস্তবে যদি সেটা কখনও না সম্ভব হয়ে ওঠে তবে তা মানবসমাজের পক্ষে বড়োই দুর্ভাগ্যের। অন্যদিকে কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে সারা পৃথিবীতে সবার জন্য জীবনধারণের অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির বণ্টন নিতান্তই অসম্ভব কল্পনাবিলাস। শেষোক্ত মতানুসারে বেশিরভাগ মানুষকেই চিরকাল আধপেটাই থেকে যেতে হবে। এটা অতি ভয়াবহ কথা। আসলে, দারিদ্র্য দূরীকরণ আর সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা খুবই জরুরি। আকাশে মেঘ ছেয়ে থাকাই একমাত্র ঘটনা নয়, আবার তো ঝলমলে রোদের দেখাও মেলে।

মন্তব্য :

দরিদ্র প্রজাবর্গের নিদারুণ দুঃখজর্জর দশায় লেখক গভীরভাবে মর্মাহত। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে সর্বজনের জন্য ধনের সমবণ্টন আর সুযোগসুবিধার সমানাধিকার নিয়ে যা বলা হয়েছে তার দিকে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি একান্তভাবে চান একদিকে দুঃসহ দারিদ্র্য আর অন্যদিকে সমাজের শ্রীসৌন্দর্য বৃদ্ধির এই বৈষম্যের

শব্দার্থ ও টীকা

অবসান। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে লেখক আশার আলো দেখতে পান।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.3

১) খোপের মধ্যে দেওয়া শব্দগুলি থেকে বাছাই করে নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ বসান—

(i) দুঃখ— (v) নিষ্ঠুর—

(ii) হতভাগ্য— (vi) উচিত—

(iii) আবশ্যক— (vii) ক্ষুদ্র—

(iv) উন্নতি— (viii) সীমা—

সৌভাগ্যবান, অবনতি, বৃহৎ, সুখ, অনুচিত, সদয়, অসীম, অনাবশ্যক।

২) অর্থ লিখুন —

অর্ধাশন—

বিধির বিধান—

নিরুপায়—

দৃশ্যপট—

সজলশ্যামল—

৩) দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখমোচনের কী উপায় হতে পারে বলে লেখক মনে করেন?

৪) কোন্ মতবাদকে লেখক 'ভারী কঠিন কথা' বলেছেন?

৫) 'দুঃখমোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে'— লেখকের এই বক্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানান।

9.6 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলার পল্লিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারা;
2. গ্রামীণ দরিদ্র জনসমাজের জীবনযাপন বিষয়ে পরিচিত হওয়া;
3. দীনদুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া;
4. মানুষের দুঃখমোচনে প্রয়াসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা;
5. লেখার গুণে একটি চিঠিও যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে তা বুঝতে পারা।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠান্ত প্রশ্ন

1. বৃষ্টি আসার আগে আকাশের ভাব আর হাওয়ার অবস্থা কেমন হয় তা বর্ণনা করুন।
2. 'এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর'— এই বাক্যাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
3. 'সোসিয়ালিস্ট'দের বক্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী মতামত দিয়েছেন?

9.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

9.1

১) (i) সোনালি (ii) ব্লটিংপ্যাড (iii) চুপসে

২) আকাশের মেঘকে। বিশাল আকারে জল-ভরা মেঘের রাশি সারা আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে।

৩) বাতাসে প্রচুর জলকণা রয়েছে।

9.2

১) (ক) (i) (খ) (i)

২) তারা খুবই গরিব। ঠিকমতো বৃষ্টি হয়ে জমি চাষের উপযোগী হলে তবে তাতে ফসল ফলিয়ে তারা কোনোমতে খেয়ে-পরে বাঁচে।

৩) জলহীন খরার অবস্থা

9.3

১) (i) সুখ, (v) সদয়, (ii) সৌভাগ্যবান, (vi) অনুচিত, (iii) অনাবশ্যক, (vii) বৃহৎ, (iv) অবনতি (viii) অসীম

২) শব্দার্থ দেখুন।

৩) এজন্য সমাজের উন্নত অংশকে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৪) মতবাদটি হল : পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণধারণের জন্য জরুরি জিনিসগুলি ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেহাতই অসম্ভব ব্যাপার।

৫) আপনার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন।

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১ — ৭ আগস্ট ১৯৪১)-এর জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা-র নাম সারদা দেবী। বিশ্বজোড়া তাঁর স্বীকৃতি। এই জন্য তাঁকে বিশ্বকবি বলা

শব্দার্থ ও টীকা

হয়। তাঁর প্রতিভাস্পর্শে বাংলাভাষার মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছে। ভারত আর বাংলাদেশ দুটি রাষ্ট্রেরই জাতীয় সংগীত তাঁর রচিত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল কথা হল প্রথাগত পদ্ধতির বদলে আনন্দময় পরিবেশে বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর অনন্য কীর্তি। এই প্রতিষ্ঠান পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি প্রচুর কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে: কাব্য— নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, কল্পনা, পূরবী, শেষ সপ্তক; উপন্যাস— গোরা, চোখের বালি, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে; নাটক— বিসর্জন, ডাকঘর, রাজা, রক্তকরবী, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের আর একটি চিঠি— তাঁর প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা—

সোলাপুর
অক্টোবর ১৮৮৫

আপনি তো সব-ডেপুটি সাহেব— বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন— আমরা কলকাতায় যাচ্ছি, সে খবর রাখেন কি? এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম— এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছ্যাক্‌রা গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্‌ঘড়্‌ হুড়্‌মুড়্‌ হইহই, সেই মাছি-ভন্‌ভন্‌ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে; কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে— তার উপরে আবার এক পাঁচিল দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা ক'জনে মিলে অশোক-কাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম, সেখানে একপ্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে municipality-র দুর্গের মধ্যে বন্দি হতে চললুম। শুনে সুখী হলেন তো?

এতদিন ভুলে ছিলেম, কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দা-টানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে। কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোশ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিনী তাকিয়া— সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে— কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করছে, সে বড়ো একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমার সেই হারমোনিয়ম! সে আপনার নীরব সংগীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাবছে, ঘড়িটা ব্রাকেটের উপরে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি তাল দিয়ে মরছে কেন? দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে— ভাবছে, ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায়? কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠছে, রবিবাবু—উ—উ—উ।

রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্ছেন, এই যা—আ—আ—ই।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না? আপনি কি এখন ইহজন্মের

শব্দার্থ ও টীকা

মতো সব-ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হলে সর্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন? যাক্, তা হলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে আমরা আশমানে বিহার করি আর বলাবলি করি, 'আহা, শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'